অলৌকিক

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অলৌকিক

এক

ইনস্পেকটর সুন্দরবাবু। নতুন নতুন খাবরের দিকে বরাবরই তাঁর প্রচণ্ড লোভ। আজ বৈকালি চায়ের আসরে পদার্পণ করেই বলে উঠলেন, জয়ন্ত ওবেলা কি বলেছিলে, মনে আছে তো?

জয়ন্ত হেসে বললে, মনে না থাকে, মনে করিয়ে দিন।

নতুন খাবার খাওয়াবে বলেছিলে।

–ও, এই কথা? খাবার তো প্রস্তুত।

খাবারের নাম শুনতে পাই না?

–মাছের প্যাটি আর অ্যাসপ্যারাগাস ওমলেট।

–রেঁধেছে কে?

–আমাদের মধু।

–মধু একটি জিনিয়াস। আনতে বলো, আনতে বলো।

চা পর্ব শেষ হল যথাসময়ে। অনেকগুলো প্যাটি আর ওমলেট উড়িয়ে সুন্দরবাবুর আনন্দ আর ধরে না।

পরিতৃপ্ত ভুঁড়ির ওপরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, মনের মতো পানাহারের মতো সুখ দুনিয়ায় আর কিছু নেই, কি বলো মানিক?

মানিক বললে, কিন্তু অত সুখের ভিতরেও কি একটি ট্রাজেডি নেই?

কীরকম?

–খেলেই খাবার ফুরিয়ে যায়।

–তা যা বলেছ।

–আবার অনেক সময় খাবার ফুরোবার আগে পেটই ভরে যায়।

–হ্যাঁ ভায়া, ওটা আবার খাবার ফুরোনোর চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার। খাবার আছে, পেট কিন্তু গ্রহণ করতে নারাজ। অসহনীয় দুঃখ।

ঠিক এমন সময়ে একটি লোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করল।

তাকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠল, আরে, আরে হরেন যে। বোসো ভাই, বোসো। সুন্দরবাবু, হরেন হচ্ছে আমার আর মানিকের বাল্যবন্ধু।

মানিক বললে, হরেন, ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু, বিখ্যাত পুলিশ ইনস্পেকটর আর প্রখ্যাত ঔদারিক।

–হুম, ঔদারিক মানে কি মানিক? শুধোলেন সুন্দরবাবু।

–ঔদারিক, অর্থাৎ উদরপরায়ণ।

–অর্থাৎ পেটুক। বেশ ভাই, বেশ, যা খুশি বলো, তোমার কথায় রাগ করে আজকের এমন খাওয়ার আনন্দটা মাটি করব না।

জয়ন্ত বললে, তারপর হরেন, তুমি কি এখন কলকাতাতেই আছ?

না, কাল এসেছি। আজই দেশে ফিরব। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের একটা খবর দিয়ে যেতে চাই।

কীরকম খবর?

–যেরকম খবর তোমরা ভালোবাসো।

–কোনও অসাধারণ ঘটনা।

–তাই।

–তাহলে আমরা শুনতে প্রস্তুত। সম্প্রতি অসাধারণ ঘটনার অভাবে আমরা কিঞ্চিৎ স্ৰিয়মান হয়ে আছি। ঝাড়ো তোমার খবরের ঝুলি।

.

দুই

হরেন বললে, সুন্দরবাবু, জয়ন্ত আর মানিক আমাদের দেশে গিয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে আগে তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের দেশ হচ্ছে একটি ছোট শহর, কলিকাতা থেকে মাইল ত্রিশ দূরে। সেখানে পনেরো-ষোলো হাজার লোকের বাস। অনেক ডেলিপ্যাসেঞ্জার কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় অফিসারও আছেন। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। এই পথটা বেশিরভাগ লোকই পায়ে হেঁটে পার হয়, যাদের সঙ্গতি আছে তারা ছ্যাকড়া গাড়ি কি সাইকেল রিকশার সাহায্য নেয়।

মাসখানেক আগে অর্থাৎ গেল মাসের প্রথম দিনে সুরথবাবু আর অবিনাশবাবু সাইকেল রিকশার চড়ে স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। তাঁরা দুজনেই বড় অফিসার, একজন মাহিনা পান হাজার টাকা, আর একজন আটশত টাকা। সেই দিনই তারা মাহিনা

পেয়েছিলেন। স্টেশন থেকে মাইলখানেক পথ এগিয়ে এসে একটা জঙ্গলের কাছে তারা দেখতে পেলেন আজব এক মূর্তি। তখন রাত হয়েছে, আকাশে ছিল সামান্য একটু চাঁদের আলো, স্পষ্ট করে কিছুই চোখে পড়ে না। তবু বোঝা গেল, মূর্তিটা অসম্ভব ঢ্যাঙা, মাথায় অন্তত নয় ফুটের কম উঁচু হবে না। প্রথমে তাদের মনে হয়েছিল সেটা কোনও নারীর মূর্তি, কারণ তার দেহের নীচের দিকে ছিল ঘাঘরার মতো কাপড়। কিন্তু তার কাছে গিয়েই বোঝা গেল সে নারী নয়, পুরুষ। ভীষণ কালো মুখখানা সম্পূর্ণ অমানুষিক। তার হাতে ছিল লাঠির বদলে লম্বা একগাছা বাঁশ। পথের ঠিক মাঝখানে একেবারে নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

রিকশাখানা কাছে গিয়ে, তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে বিষম চিৎকার করে ধমকে বলে উঠল, এই উল্লুক, গাড়ি থামা। তার পরেই সে রিভলভার বার করে ঘোড়া টিপে দিলে। দুম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিকশার চালক গাড়ি ফেলে পলায়ন করলে। সুরথবাবু আর অবিনাশবাবুও গাড়ি থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই মূর্তিটা তাঁদের দিকে রিভলভার তুলে কর্কশ স্বরে বললে, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, সঙ্গে যা আছে সব রিকশার ওপরে রেখে এখান থেকে সরে পড়ো।

তারা প্রাণে বাঁচতেই চাইলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গের সমস্ত টাকা, হাতঘড়ি, আংটি এমনকী ফাউন্টেন পেনটি পর্যন্ত সেইখানে ফেলে রেখে তারা তাড়াতাড়ি চম্পট দিলেন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে রিকশার পাশে কুড়িয়ে পায় কেবল সেই লম্বা বাঁশটাকে।

প্রথম ঘটনার সাতদিন পরে ঘটে দ্বিতীয় ঘটনা। মৃণালবাবু আমাদের দেশের লোক। মেয়ের বিয়ের জন্যে তিনি কলকাতায় গহনা গড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে ট্রেন থেকে নেমে পাঁচ হাজার টাকার গহনা নিয়ে পদব্রজেই আসছিলেন। তিনিও একটা জঙ্গলের পাশে সেই সুদীর্ঘ ভয়াবহ মূর্তিটিকে অস্পষ্টভাবে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেদিন কতকটা স্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল বটে কিন্তু জঙ্গলের ছায়া ঘেঁষে মূর্তিটা এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে ভালো করে কিছুই দেখবার যো ছিল না। সেদিনও মুর্তিটা

রিভলভার ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে মৃণালবাবুর গহনাগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। সেবারেও পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায় কেবল একগাছা লম্বা বাঁশ।

এইবারে তৃতীয় ঘটনা। শশীপদ আমার প্রতিবেশী। কলকাতার বড়বাজারে তার কাপড়ের দোকান। ফি শনিবারে সে দেশে আসে-গেল শনিবারেও আসছিল। তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল, কিন্তু উঁদ ওঠেনি। স্টেশন থেকে শহরে আসতে-আসতে পথের একটা মোড় ফিরেই। শশীপদ সভয়ে দেখতে পায় সেই অসম্ভব ঢ্যাঙা বীভৎস মূর্তিটাকে। মানে ভালো করে সে। কিছুই দেখতে পায়নি, কেবল এইটুকু বুঝেছিল যে মূর্তিটা সহজ মানুষের চেয়ে প্রায় ডবল উঁচু। সেদিনও সে রিভলভার ছুঁড়ে শশীপদর কাছ থেকে সাত হাজার টাকা হস্তগত করে। শশীপদ দৌড়ে একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেইখানে বসেই শুনতে পায় খটাখট খটাখট-খটাখট করে কীসের শব্দ। ক্রমেই দূরে গিয়ে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। শশীপদ ভয়ে সারা রাত বসেছিল জঙ্গলের ভিতরেই। সকালে বাইরে এসে পথের ওপরে দেখতে পায় একগাছা বাঁশ।

জয়ন্ত, এই তো ব্যাপার। পরপর তিন-তিনটে অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় আমাদের শহর রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর দলে খুব ভারী না হলে পথিকরা স্টেশন থেকে ওপথ দিয়ে শহরে আসতে চায় না। অনেকেই মূর্তিটাকে অলৌকিক বলেই ধরে নিয়েছে। এখন তোমার মত কি?

.

তিন

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ঘটনাগুলোর মধ্যে কী কী লক্ষ করবার আছে, তা দেখ। বাংলাদেশে নয় ফুট উঁচু মানুষ থাকলে এতদিনে সে সুবিখ্যাত হয়ে পড়ত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে অপরাধী নয় ফুট উঁচু নয়। সে দেহের নীচের দিকটা ঘাগরায় বা ঘেরাটোপে ঢেকে রাখে। কেন? তার মুখ অমানুষিক বলে মনে হয়। কেন? সে একটা লম্বা বাঁশ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার বাঁশটাকে

ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায়। কেন? সে প্রত্যেকবারেই চেষ্টা করে, তার চেহারা কেউ যেন স্পষ্ট করে দেখতে না পায় কেন? শশীপদ শুনেছে, খটাখট খটাখট করে একটা শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। কীসের শব্দ?

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ?

কিছু কিছু পারছি বইকী! হরেন, ওই তিনটে ঘটনায় যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছে, তারা কি শহরের বিভিন্ন পল্লির লোক?

না, তারা সকলেই প্রায় এক পাড়াতেই বাস করেন।

–তবে তোমাদের পাড়ায় বা পাড়ার কাছাকাছি কোথাও বাস করে এই অপরাধী!

–কেমন করে জানলে?

নইলে ঠিক কোন দিনে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি প্রচুর টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে, অপরাধী নিশ্চয়ই সে খবর রাখতে পারত না।

না জয়ন্ত, আমাদের পাড়ায় কেন, আমাদের শহরেও নয় ফুট উঁচু লোক নেই।

–আমিও ওকথা জানি।

–তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

–আপাতত বেশি কিছু বুঝেও কাজ নেই। আমাকে আরও কিঞ্চিৎ চিন্তা করবার সময় দাও। তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ তো?

হ্যাঁ।

–পরশুদিনই আমার কাছ থেকে একখানা জরুরি চিঠি পাবে। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে তুমি কলকাতার এসে আমাদের দেশে নিয়ে যাবে।

হরেন চলে গেল। জয়ন্ত যেন নিজের মনেই গুণগুণ করে বলল, খটাখট খটখট খটাখট। মূল্যবান সূত্র।

.

চার

নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলায় হরেন এসে হাজির।

জয়ন্ত শুধোলে, চিঠিতে যা যা বলেছি ঠিক সেইমতো কাজ করেছ তো?

–অবিকল।

–মানিক, সুন্দরবাবুকে ফোন করে জানাও, আজ সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে আমরা যাত্রা করব।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময়ে তারা হরেনদের দেশে এসে নামল।

আকাশ সেদিন নিশ্চন্দ্র। স্টেশন থেকে শহরে যাবার রাস্তায় সরকারি তেলের আলোগুলো অনেক তফাতে-তফাতে থেকে মিটমিট করে জ্বলে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকেই আরও ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছিল! নির্জন পথ! আশপাশের ঝোপঝাড়ের বাসিন্দা কেবল মুখর ঝিল্লির দল। দুখানা সাইকেল রিকশায় চড়ে তারা যাচ্ছিল। প্রথম গাড়িতে বসেছিল হরেন ও মানিক। দ্বিতীয় গাড়িতে জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কি যে বুঝেছ তা তুমিই জানো, আমি তো ছাই এ ব্যাপারটার ল্যাজামুড়ো কিছুতেই ধরতে পারিনি।

জয়ন্ত বললে, ঘটনাগুলো আমিও শুনেছি, আপনিও শুনেছেন। তারপর প্রধান প্রধান সূত্রের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ছাড়িনি। মাথা খাটালে আপনি অনেকখানিই আন্দাজ করতে পারতেন।

–মস্তক যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করেছি ভায়া, কিন্তু খানিকটা ধোঁয়া (তাও গাঁজার ধোঁয়া) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।

–মুটেরাও মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করে কিন্তু তারা উপলব্ধি করে কতটুকু সুন্দরবাবু, আমি আপনাকে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে বলছি না, মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে বলছি।

–একটা শক্ত রকম গালাগালি দিলে বটে কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস, আজকেই তুমি এই মামলাটার কিনারা করতে পারবে?

–হয়তো পারব, কারণ অপরাধীরা প্রায়ই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বিপদে পড়ে। হয়তো পারব না, কারণ কোনও কোনও অপরাধী নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ত্যাগ করতেও পারে। কিন্তু হুশিয়ার! পথের মাঝখানে আবছায়া গোছের কি-একটা দেখা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে! মুক্ত আকাশের স্বাভাবিক আলো দেখিয়ে দিলে, অন্ধকারের মধ্যে একটা অচঞ্চল ও নিশ্চল ও সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি। বাতাসে নড়ে-নড়ে উঠছে কেবল তার পরনের জামা-কাপড়গুলো।

আচম্বিতে একটা অত্যন্ত কর্কশ ও হিংস্র চিৎকার চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে জেগে উঠল–এই! থামাও গাড়ি, থামাও গাড়ি! সঙ্গে-সঙ্গে রিভলভারের শব্দ।

কিন্তু তার আগেই অতি-সতর্ক জয়ন্ত ছুটন্ত গাড়ি থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়েছে। এবং গর্জন করে উঠেছে তারও হাতের রিভলভার!

গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল মূর্তির ডান হাতখানা, তার রিভলভারটা খসে পড়ল মাটির ওপরে সশব্দে। কেবল রিভলভার নয়, আর একটাও কি মাটিতে পড়ার শব্দ হল–বোধহয়

বংশদণ্ড! অস্ফুট আর্তনাদ করে মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে পালাবার উপক্রম করলে, কিন্তু পারলে না, এক সেকেন্ড টলটলায়মান হয়েই হুড়মুড় করে লম্বমান হল একেবারে পথের উপর।

দপদপিয়ে জ্বলে উঠল চার-চারটে টর্চের বিদ্যুত্বহ্নি।

জয়ন্ত ক্ষিপ্রহস্তে ভূপতিত মূর্তিটার গা থেকে কাপড়-চোপড়গুলো টান মেরে খুলে দিলে। দেখা গেল, তার দুই পদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে দুইখানা সুদীর্ঘ যষ্টি ইংরেজিতে যাকে বলে still। এবং বাংলায় যাকে বলে রণ-পা।

জয়ন্ত বললে, দেখছি, এর মুখে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড মুখোশকাফ্রির মুখোশ। এখন। মুখোশের তলায় আছে কার শ্রীমুখ, সেটাও দেখা যেতে পারে। আর এক টানে খসে পড়ল মুখোশও।

হরেন সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে, এ যে দেখছি আমাদের পাড়ার বাপে-খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে রামধন মুখুয্যে। এ বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কুপথে যায়, কুসঙ্গীদের দলে মেশে, নেশাখোর হয়, জুয়া খেলে, পাড়ার লোকদের ওপরে অত্যাচার করে। এর জন্যে সবাই এ্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু এর পেটে-পেটে যে এমন শয়তানি, এতটা তো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। ছিল!

.

পাঁচ

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, প্রধান প্রধান সূত্রের কথা আগেই বলেছি, এখন সব কথা আবার নতুন করে বলবার দরকার নেই। কেবল দু-তিনটে ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হবে। গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অপরাধী হরেনেরই পাড়ার লোক। সে পাড়ায়-এমনকী, সে শহরেও নয় ফুট উঁচু কোনও লোকই নেই। সুতরাং ধরে নিলুম সে উঁচু হয়েছিল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। অপরাধের সময়ে সে আবছায়ায় অবস্থান করে-

পাছে কেউ তার কৃত্রিম উপায়টা আবিষ্কার করে ফেলে; তাতেই আমার ধারণা হল দৃঢ়মূল। এখন সেই কৃত্রিম উপায়টা কি হতে পারে? শশীপদ শুনেছিল, খটাখট খটাখট করে কি একটা শব্দ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে! এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতে ধাঁ করে আমার মাথায় আসে রণ-পার কথা। রণ-পার ওপরে আরোহণ করলে মানুষ কেবল উঁচু হয়ে ওঠে না, খুব দ্রুতবেগে চলাচলও করতে পারে। সেকালে বাংলাদেশের ডাকাতরা এই রণ-পায় চড়ে এক এক রাতেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হয়ে যেতে পারত। পদক্ষেপের সময়ে রণ-পা যখন মাটির ওপরে পড়ে, তখন খটাখট করে শব্দ হয়, কিন্তু রণ-পা-এ উঠে কেউ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, টাল সামলাবার জন্যে চলাফেরা করতে হয়। অপরাধী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে একগাছা বাঁশের সাহায্য গ্রহণ করত। কার্য সিদ্ধির পর বাঁশটাকে সে ঘটনাস্থলেই পরিত্যাগ করে যেত, কারণ রণ-পা-এ চড়ে ছোটবার সময় এত বড় একটা বাঁশ হয়ে ওঠে উপসর্গ মতো।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম এসব তো বুঝলুম, কিন্তু আসামি এমন বোকার মতো আমাদের হাতে ধরা দিলে কেন, সেটাতো বোঝা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত হাসতে-হাসতে বললে, ওটা আবার কল্পনা শক্তির মহিমা। আগেই বলেছি তো, অপরাধীরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়েই বিপদে পড়ে। অপরাধী সর্বদাই খবর রাখত, পাড়ার কোনও ব্যক্তি কবে কী করবে বা কী করবে না। আমার নির্দেশ অনুসারে হরেন রটিয়ে দিয়েছিল, কলকাতার ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক ফেল হচ্ছে, সে ব্যাঙ্কে আর নিজের টাকা রাখবে না। অমুক তারিখে কলকাতায় গিয়ে সব টাকা তুলে নিয়ে আসবে। অপরাধী এ টোপ না গিলে পারেনি।

সুন্দরবাবু বললেন, একেই বলে, ফাঁকতালে কিস্তিমাত।